তরুন মজুমদারের নতুন ছবি আলো

রজত রায়

বাংলাদেশে ছিলাম যেন আটটি দশক আগে -
(প্রযোজনা প্রিজম এন্টারপ্রাইজ প্রাঃ লিঃ। কাহিনিসূত্র ঃ বিভূতিভুষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছোটগল্প কিন্নরদল। চিত্রনাট্য ও পলিচালনা তণ মজুমদার। চিত্রগ্রহণ শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। শিল্প - নির্দেশনা সুরেশ এবং জয়চন্দ্র চন্দ্র। সঙ্গীত অঙ্কতী - শিবাজী। সম্পাদনা শক্তি রায়। অভিনয়ে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, কুণাল মিত্র, ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়, রীতা দত্ত চত্রবর্তী, ভারতী দেবী, অভিষেক চট্টোপাধ্যায়, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়,সৌমিলি বিশ্বাস, আনন্দী বসু এবং আরো অনেকে।)

প্রায় দেড়শো বছর পিছনের পটভূমিকায় সামন্ত সভ্যতার পরিমণ্ডলে দরিদ্র গ্রামীণ মানুষের এক ছোট দুঃখ, ছোট ছোট অন্ধকার, আর ছোট ছোট প্রেম ভালবাসার কাহিনি লিখেছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কাহিনির মুল থিম ছিল পিছিয়ে পড়া বদ্ধ গ্রামীণ মানুষের, বিশেষ করে মহিলাদের, অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের কাহিনি, ছোটমনের মানুষ থেকে উদার মনের মনুষ্যত্বের পথে এগিয়ে যাওয়ার কাহিনি। শিল্পের জগৎ নৃত্য চিত্রকলা ---এমনকী বয়নশিল্পও যে মানুষকে উন্নততর হৃদয় ও জীবনে নিয়ে যেতে পারে, এই কথাটাই একটি চোদ্দ পৃষ্ঠার ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে বলেছিলেন বিভুতিভুষণ। প্রায় দেড় শতক আগের সমাজজীবনের পটভূমিতে লেখা গল্পকে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগের বাংলার শহর এবং গ্রামের জীবনে স্থাপিত করেএকটি চলচ্ছবি তুলেছেন প্রবীন চিত্র পরিচালক তণ মজুমদার।

বিভূতিভূষন এবং তণ মজুমদার দুজনেই পাঠক - দর্শককে শিল্পের স্নিগ্ধ ধারায় স্নান করে নিজেদের চিত্তকে নির্মল উদার এবং পবিত্র করে নিতে বলেন। বিভূতিভুষণ যে গল্পের নাম দিয়েছিলেন কিন্নরদল এবং যে প্রধান চরিত্রটির নাম দিয়েছিলেন (অবশ্যই পুরোপুরি সামন্ত ভাবধারার পরিচায়ক) শ্রীপতির বৌ, তণ মজুমদার সেই আলোয় উত্তরণের কাহিনির প্রধান চরিত্রটির নাম অত্যন্ত মানানসই এবং প্রতীকার্থেই দিয়েছেন -- আলো, আলো চৌধুরি।

গল্পের মুল থিমটি মানবজীবনের এক চিরকালীন সত্য। প্রেম দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে, সঙ্গীত দিয়ে, নৃত্য দিয়ে অথবা সৃজনশীল শিল্পের যে কোনো শাখার সাহায্যে মানুষ নিজেকে আরও উন্নত মানুষে পরিণত করতে পারে।আড়াই হাজার বছর পিছনে তাকালে দেখা যায় গৌতম বুদ্ধ মানুষের মন জয় করেছিলেন শুধু অহিংসা প্রেম ও ভালোবাসা দিয়ে। তার প্রায় পঁচিশ বছর পরে আর এক মানবপুত্র যিশুখ্রিষ্ট বলেছিলেন--- সবাই অমৃতের সন্তান, মানুষের অপরাধ কে ক্ষমা করো, সহানুভুতি দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে সেবা দিয়ে। তিনি আবারও চিরন্তর মানুষের জয়ের কথা বলে গেলেন। এরও প্রায় দেড় হাজার বছর বাদে নবদ্বীপের এক বঙ্গসন্তানও এইভাবেই মানুষের হৃদয়কে জয় করেছিলেন, জাতপাত ধর্ম -- সব বিভেদের ঊর্দ্ধে মনুষ্যত্বকে তুলে ধরেছিলেন।

আমাদের সমকালে আমরা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এবং অ্যাগনেস গোনশা (মাদার টেরিজা) নামে দুটি মানুষকে দেখেছি। প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মনুষ্যত্বের উজ্জ্বল উদাহরণ।

ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়াটা বোধহয় হাস্যকর। কিন্তু মুল প্রশ্ন একটি থেকেই যায়। যে পাঁচজন মানুষ এর নাম উচচারণ করা হলো তাঁরা প্রকৃতপক্ষে সকলেই ছিলেন রক্ত মাংসের এক একজন মানুষ। একজন মানুষ এর পক্ষে যা সম্ভব হয়েছে, অন্য আর একজন মানুষ সচেতনভাবে চেষ্টা করলে তার একশো ভাগের এক ভাগ, নিদেন পক্ষে তার হাজার ভাগের একভাগ হতে পারবেন না কেন? সুতরাং আলো চৌধুরির কাহিনি দেখতে দেখতে যদি দু-একটি বিরা বড় নাম মনের মধ্যে হঠাৎ ঝিলিক মেরেই যায় তাহলে সেটা বোধহয় খুব একটা অস্বাভাবিক হয় না।

বিদুষী আলো চৌধুরি কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে গান গেয়ে থাকেন। সেই গান শুনেই প্রেমে পড়ে যায় যুবক শ্রীপতি (এই অংশটুকু বিভূতিভুষণের নয়, তণ মজুমদারের। অবশ্য সেটা বেমানান হয়নি, দোষেরও কিছু নয়। তারপরে জ্যাঠামশাই সহযোগে আলোর ভাইবোনদের নিয়ে বিরাট বড় সংসারের একটি চমৎকার ছবি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তণবাবু তুলে ধরেন রবীন্দ্রনাথের গানের সাহায্য নিয়ে.....
হারে রে রে রে রে, আমায় ছেড়ে দে রে, দে রে ---
যেমন ছাড়া বনের পাখি মনের আনন্দে রে।
বিয়ের পর শহরের রূপসী বিদুষী মেয়ে আলো মধ্যযুগীয় অন্ধকারে ঢাকা পিছিয়ে পড়া গ্রাম্য পরিবেশে বাস করতে এলো। অবশ্য ছবির শুতেই শ্রীপতির ছোট একটি চিঠি পাঠের মারফত দর্শককে এই নোংরা গ্রামীণ জীবনের কথা আগেভাগেই জানিয়ে দেওয়া হয়। ছবির গোড়ায় যা নিতান্তই চিত্রনাট্যের নিজস্ব স্টাইলে শুধু একটি চিঠি পাঠের মারফত জানানো হয়েছে, স্বয়ং বিভূতিভূষণ কিন্তু তার চাইতে অনেক বেশি নির্দয় ভাবে অধিকতর কদর্য গ্রাম্য সমাজের ছবি এঁকেছেন -- যে গ্রামে মানুষ কুৎসিতভাবে জাতপাত মানে, মিথ্যে কথা বলে, চুরি করে, পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষা এবং বিদ্বেষ যাদের অস্থিমজ্জায় মিশে আছে, পরনিন্দা করা যাদের একমাত্র আলোচ্য বিষয়, যারা বিন্দুমাত্র শিষ্টাচার এবং সৌজন্যের ধার ধারে না,সেই গ্রামে নববধু আলো সত্যিকারের আলোর বার্তা নিয়ে এলো।

সহমর্মিতা দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে, সেবা দিয়ে সে গ্রামের ছোটবড় বয়স নির্বিশেষে সমস্ত মেয়েদের মন জয় করে নিল (বিভূতিভূষণ এবং তণ মজুমদার দুজনেই এখানে একমত)। দর্শকের উপলব্ধিতেও এই অনুভূতিটা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু একটি প্রশ্ন থেকেই যায়, কঠোরভাবে পিতৃতান্ত্রিক এই সমাজে পুষদের কোনো প্রতিত্রিয়া দেখানো হল না কেন ? ছবিটি কি তাহলে সত্যের আংশিক প্রতিফলন ?

ত্রূর বাস্তবতার ছবি তুলতে গিয়েও চিরকালের বালক তণ মজুমদার বালিকা বধুর জগৎ থেকে বেরিয়ে আসতে পারলেন না। তাঁকে আমদানি করতে হলো শ্রীপতির এক ন্যাকা বন্ধু, বন্ধুপত্নী এবং বেশ কিছুটা ভাঁড়ামো। (বলাই বাহুল্য, এই বন্ধুবেশী ভাঁড়টি বিভূতিভুষণের নয়, বালক তণ মজুমদারের মস্তিষ্কপ্রসুত। সব চাইতে দুঃসহসেই দৃশ্যটি যেখানে আলো বৌদির সরকারি সাহায্যের জন্য আবেদনের প্রস্তাবে ন্যাকা বন্ধুটি ঘাড় বেঁকিয়ে চিবিয়েচিবিয়ে নাকি সুরে উচচারণ করে..... আগে দুই কাপ চা ঘুষ দেওয়া হোক। দর্শক হিসেবে ওই শটটির জন্য বিতৃষ্ণায় আমার গা ঘিন ঘিন করতে থাকে।

শ্রীপতির ছোট ভাই এবং আলো ছোট বোন রমাকে নিয়ে সুযোগ পেয়েই তণবাবু এক টুকরো বালি কা বধু বানিয়ে বসেন। এক সময়ে এই বালিকা বধূদের বেশ ভালোই লাগত। কিন্তু তণ মজুমদার তাঁর দর্শককে আর কতদিন বালক বালিকার স্তরে ধরে রাখতে চান ? তাঁরা কি কোনোদিনই আর সাবালক হতে পারবেন না ? স্যাটেলাইট টি. ভি, ডিভিডি, মোবাই ফোন, এস. এম. এস. এবং কম্পিউটারের প্রভার যেখানে দুরদুরান্তের গ্রামের অন্তঃপুরেও পৌঁছে গেছে, সেখানে যুবক যুবতীদের প্রেমের চেহারাতেও পরিবর্তন আসবেই। সেটাকে মেনে না নিলে খুবইবোকামির কাজ হবে।
অন্য কোনো আধুনিক চলচিচত্রকার হয়তো এই গল্পটা থেকেই বানাতে পারতেন একুশ শতকের এক প্রাসঙ্গিক এবং তাৎপর্যপূর্ণ ছবি। কিন্তু তণ মজুমদারের হাতে পড়ে আমরা আবার বালিকা বধুর জগৎ থেকেই ঘুরে এলাম আর একবার,

এবার বিভূতিভূষণের পথ ধরে। তবে পিছন দিক থেকে এই ঘুরে আসাটা মোটামুটি মন্দ লাগেনি .... গল্প, অভিনয় আর রবীন্দ্রসঙ্গীত... সব মিলিয়ে বেশ উপভোগ্য। বিভূতিভুষণের এই গল্প থেকে চিত্রনাট্য লিখতে গিয়ে তণবাবু সবচাইতে প্রশংসনীয় যে কাজটি করেছেন তা হলো রবীন্দ্রনাথের গানের সাহায্য নেওয়া। দশটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত প্রয়োগ চরিত্রগুলিকে পরিস্ফুটন এবং গল্পের গতিকে দ্রুত ও সাবলীল করতে প্রচুর কাজে লেগেছে। আলোর যে শেষ গানটি কলের গান-এর জন্য রেকর্ড করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে দশর্কের সঙ্গে মূল চরিত্র এবং মহিলাদের একটা কণ মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে,.... বিভূতিভূষণের কল্পনায় তা ছিল মীরার একটি ভজনবিরহিনী মীরা জাগে তবে অনুরাগে, গিরিধর নাগর...। তণবাবু চমৎকারভাবে সেই জায়গায় প্রয়োগ করেছেন....

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ এই বাটে,
বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে,
চুকিয়ে দেব বেচা কানা,
মিটিয়ে দেব লেনা দেনা,
বন্ধ হবে আনাগোনা এই ঘাটে .....
আমায় তখন নাইবা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাইবা আমায় ডাকলে।

আলোর অকালমৃত্যু হয়। সদ্যোজাতা শিশুকন্যাকে নিয়ে শ্রীপতি গ্রামে ফিরে আসে। পরিবর্তিত গ্রামীণ মহিলারা স্বত স্ফুর্তভাবে শিশুকন্যাটিকে সমবেতভাবে লালন-পালনের দায়িত্ব নেন। আলোর চরিত্রের দ্যুতিতে গ্রাক্য সমাজ আলোকিত হয়ে ওঠে।

ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের অভিনয়ে আলোর চরিত্র একেবারে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কোনোদিন ভোলা যাবে না ভারতী দেবীর জীবনসায়াহ্নের মর্মস্পশী অভিনয়। যিনি আলোর কাছ থেকে চাল সাহায্য নিয়ে পরে বাজারে তা বেচে দেন (মাঝে মাঝে ছোট পর্দাতেও অভিনয় করেন, যদিও দুর্ভাগ্যবশত কোনো সিরিয়ালই আমি দেখি না) সেই রীতা দত্ত চত্রবর্তীর অভিনয়ের দক্ষতাও উচচমানের। ছোটখাট চরিত্রগুলির টিম-ওয়ার্ক প্রশংসানীয়।

শিক্ষিত ভদ্র মধ্যবিত্ত বাঙালি সপরিবারে বসে একটি বাংলা ছবি দেখবে, সেই সুযোগ আজকাল আর বিশেষ পাওয়া যায় না। বছরে বড়জোর দু-তিনটির বেশি সভ্য বাংলা ছবি আজকাল আর হয় না। তম মজুমদারকে ধন্যবাদ। তিনি গত চল্লিশ বছরের ও বেশি সময় ধরে বাঙালি জাতিকে সবাই মিলে দেখার মতো ছবি একটির পর একটি উপহার দিয়ে চলেছেন। তিনি দীর্ঘদিন সত্রিয় থেকে বাঙালি দর্শককে পরিচ্ছন্ন বিনোদন উপহার দিন ..... এই আমাদের আকাঙ্খা।